২৫ টি প্রচলিত দিবস এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

১ মুখে ভাত : অন্নপ্রাশনের অনুকরণে বহু নামধারী মুসলিম পরিবারও নিজেদের ছেলে-মেয়েদের মুখে প্রথম ভাত দেয়ার জন্য জাঁকজমক অনুষ্ঠান করে থাকে। আয়োজন থাকে নানা ধরনের খাবারের। নির্দিষ্ট আচার পালন করে উপস্থিত সকলে একে একে শিশুর মুখে প্রথম ভাত তুলে দেয় এবং সে সাথে সমালোচনা করা হয়। এই অবসরে অনেকে প্রচলিত মীলাদও পড়িয়ে থাকে। সচেতন মুসলিম মাত্রই বুঝতে পারবেন যে, এটি বিজাতির অনুকরণে একটি জঘন্য বিদআত।

২ জন্মদিন : শিশুর জন্মদিন (হ্যাপি বার্থ ডে) পালন করা এবং সেদিনে আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব মিলিত হয়ে কোনো উৎসব উদযাপন করা, সেদিনে শিমু (বা বুড়ো) কে বিশেষ দুআ, সালাম বা উপহার পেশ করা, বয়স অনুসারে বছর গুনতি করে মোমবাতি জ্বালিয়ে তা ফুঁ দিয়ে নিভানো। অতঃপর কেক কেটে খাওয়া প্রভৃতি বিধর্মীয় প্রথা, মুসলমানদের জন্য তা বৈধ নয়। বৈধ নয় এ উপলক্ষ্যে দাওয়াতে অংশগ্রহণ করাও। বৈধ নয় সে উপলক্ষ্যে এ শিশুকে দুআ, মুবারকবাদ ও উপহার দেয়া। (ফাতাহওয়া ইসলমিয়্যাহ ১/৮৭, ১১৫, মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৩০২)

নিঃসন্দেহে এটি একটি সুন্নাত; ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের সুন্নাত। ইসলাম ও নবীর সুন্নাত অর্জন করে বিজাতির সুন্নাত অবলম্বন করা মুসলমানদের জন্য বড়ই ধিক্কার ও ন্যাক্কারজনক। প্রিয় নবী সত্যই বলেছেন, "অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির সুন্নাত অনুসরণ করবে বিঘত-বিঘত এবং হাত-হাত (সম) পরিমাণ। এমনকি তারা যদি গো-সাপের (সাপ) গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও তাদের পিছনে পিছনে যাবে। (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর প্রকাশ্যে সঙ্গম করে, তাহলে তোমরাও তা করবে!)" সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ইহুদী ও নাসারার অনুকরণ করার কথা বলছেন?' তিনি বললেন, "তবে আবার কার?" (বুখারী, মুসলিম ২৬৬৯, হাকেম, আহমদ, সহীহুল জামে' ৫০৬৭ নং)

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুরূপ অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই দলভূক্ত।" (আহমদ ২/৫০, আবূ দাউদ ৪০৩১, সহীহুল জামে' ৬০২৫ নং) তিনি আরো বলেন, "সে ব্যক্তি আমরা দলভূক্ত নয়, যে আমাদেরকে ত্যাগ করে অন্য কারো সাদৃশ্য অবলম্বন করে। তোমরা ইহুদীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না, আর খ্রীষ্টানদেরও সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।" (তিরমিযী ২৬৯৫ নংম, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১৯৪ নং)

এছাড়া জন্মদিনের খুশী ও উৎসব করা অত্যান্ত বোকামী। জীবন থেকে একটি বছর ঝরে গেলে তার জন্য আক্ষেপ ও দুঃখ করা উচিত, খুশী নয়। লৌকিকতার সাথে উপহার-সামগ্রীর প্রত্যাশা। আশা ভঙ্গ হলে নানা আলোচনা সমালোচনা। তদানুরূপ বৈধ নয় বড় বড় ব্যক্তিত্বের জন্মবার্ষিকী অথবা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা।

প্রথমত : আমাদের শরীয়তে তা পালন করার কোনো বিধান নেই। ইসলামে কত লক্ষ লক্ষ আম্বিয়া, সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে'-তাবেয়ীন, আয়িম্মা, মুহাদ্দেসীন, মুফাসসেরীন, আউলিয়া, শায়খুল ইসলাম, শায়খুল হাদীস, রাজা-বাদশা ও কবি-সাহিত্যিকদের জন্ম-মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু তাঁদের কারো জন্ম অথবা মৃত্যু দিবস পালন করা হয়নি পূর্ববর্তীদের যুগে।

আর **দ্বিতীয়ত :** তা পালন করতে হলে প্রায় প্রত্যহ কারো না কারো জন্মদিন পালন করে আনন্দ ও শোক এবং হাসি ও কান্না উভয়ই প্রকাশ করতে হবে। আর সেই সাথে বছরের প্রায় সকল দিনগুলোতে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে কাজ বন্ধ করে সমাজকে পঙ্গুত্বের দিকে ঠেলে দেয়া হবে।

অতএব মহান ব্যক্তিবর্গের মহান চরিত্র ও কার্যবলী নিয়ে আমরা তাঁদেরকে স্মরণ করব। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁদের মহান স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে জাগরিত রাখব আমাদের চরিত্র ও কর্মের মাধ্যমেই। আর তাঁদের স্মৃতিকে কেবল আনুষ্ঠানিকতার বেড়াজালে জড়িয়ে রাখব না। এই সংকল্পই হওয়া উচিত প্রত্যেকটি কর্মপ্রিয় খাঁটি মুসলিমের।

৩ মৃত ব্যক্তির বাড়ির ভোজ : মরা-বাড়ির পক্ষ হতে সাধারণভাবে গ্রাম ও আত্মীয়-স্বজনকে (অলীমার মতো) দাওয়াত দেয়া

এবং আত্মীয়দের সেই দাওয়াত গ্রহণ করা বিধেয় নয়। বরং তা বড় বিদআত। ১৫৩ (মু'জামুল বিদা ১৬৩ পৃঃ) বিধেয় হলো কোনো আত্মীয় অথবা প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে মরা-বাড়ির লোকেদের জন্যই পেট ভরার মতো খানা-পিনা প্রস্তুত করে পাঠানো।

আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর বলেন, জা'ফর (রা) শহীদ হওয়ার পর যখন তাঁর সে খবর পৌঁছল, তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ''জা'ফরের পরিজনের জন্য তোমরা খাদ্য প্রস্তুত কর। কারণ, তাদের নিকট এমন সংবাদ পৌঁছেছে; যা তাদেরকে বিভোর করে রাখবে।'' (আবূ দাউদ ৩১৩২, তিরমিযী ৯৯৮, ইবনে মাজাহ ১৬১০)

সাহাবী জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রা) বলেন, 'দাফনের পর মরা বাড়িতে খানা ও ভোজের আয়োজনকে এবং লোকদের একত্রিত আমরা জাহেলিয়াতের মাতব হিসেবে গণ্য করতাম। (যা ইসলামে হারাম।) (আহমদ ৬৯০৫, ইবনে মাজাহ ১৬১২, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৩০৮) কিন্তু যে সমাজে সে সহানুভূতি ও সহায়তা নেই, সেখানে কি হবে? বদনাম নেয়া ভালো হবে, নাকি জাহেলিয়াত কর্ম?

পক্ষান্তরে খাবারের ব্যবস্থা না হলে নিজেদের তথা দূরবর্তী মেহমানদের (যাদের সেদিন বাড়ি ফিরা অসম্ভব তাদের। জন্য তো নাচারে ডালভাত করতেই হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সুনামের লোভে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাছ, গোশতের ভোজবাজিতে আত্মীয় স্বজন, জানাযার কর্মী মাদ্রাসার ষ্টাফ ও ছাত্রবৃন্দ (!) পাড়া-প্রতিবেশী এবং কখনো বা গোটা গ্রামকে সাদরে নিমন্ত্রণ করা হয় ও তা পরমানন্দে খাওয়ানোও হয়, তথা কিছুতে একটু লবণ কম হলে দুর্নাম করতেও কসুর হয় না। এমন ভোজবাজি যে জাহেলি যুগ থেকেও নিকৃষ্টতর তাতে কারো সন্দেহ থাকতে পারে না।

মুসনাদে আহমদের (৫/২৯৩) এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, একদা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবিগণ এক জানাযার কাজ সেরে ফিরে এলে কুরাইশের এক মহিলা তাঁদেরকে একটি ছাগল যবাই করে দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ঘটনার সাথে মরা বাড়িতে ভোজ করার বা খাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। যেহেতু সে মহিলা ঐ মৃতব্যক্তির কেউ ছিল না; বরং ঐ সময় দাওয়াত হয়েছিল বলে হাদীসে তার উল্লেখ এসেছে। অতএব উক্ত হাদীস থেকে পেটপূজারীদের দলীল গ্রহণ করা বা একপাত খাওযার জন্য ঐ হাদীসকে দলীল স্বরূপ পেশ করা সত্যিই হাস্যকর।

৪ মৃত্যু-বার্ষিকী : কেউ মারা গেলে তাঁর ব্যক্তিত্ব যত বড়ই হোক, তার স্মরণে প্রত্যেক বছর তার মৃত্যু-তারিখে কোনো স্মরণ-সভা , শোক-দিবস , দুআ-মজলিম , মীলাদ-মাহফিল , ঈসালে-সাওয়াব , উরস-উৎসব , মৃত্যু-বার্ষিকী , ভোজ-আয়োজন ইত্যাদি বিদআত। ঈসালে সাওয়াব করতে হলে শরীয়তসম্মত পন্থাতেই করতে হবে।নচেৎ সাওয়াব ঈসাল হবে না। কারো স্মরণ তাজা করতে হলে তাতে লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখতে হবে এবং শরীয়তের অনুমোদন থাকতে হবে। নচেৎ হিতেবিপরীত হলে ফল কি? মৃত্যু-বার্ষিকী পালন করা বৈধ হলে আল্লাহর রাসূল (সা)-এর মৃত্যু তারিখে তা পালন করা বিধেয় হতো এবং তিনি খোদ সাহাবা (রা)-কে এ বিষয়ে কোনো না কোনো নির্দেশ বা ইঙ্গিত দিয়ে যেতেন। পক্ষান্তরে আমরা যদি বুযুর্গদের জন্ম ও মৃত্যু-বার্ষিকী পালন করি , তাহলে বছরের প্রায় প্রত্যেকটি দিন এক একটি পর্বে পরিণত হয়ে যাবে। আর বর্তমান প্রথায় তা পালন করতে করতে প্রায় প্রত্যেক দিনই হালুয়া-রুটি , মীলাদ-মাহফিল , শোক অথবা আনন্দ, ছুটি ও বন্ধ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে। তাহলে তা কি আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে?

আমাদের স্মরণীয় বিষয় স্মরণ করতে হবে। বরণীয় ব্যক্তিবর্গের করণীয় সম্পর্কে সচেষ্ট হলে তবেই আমরা সফলকাম হতে পারব। নচেৎ তাঁদের নামে সিন্নী-মিঠাই বিতরণ করে , ধূপ-মোমবাতি জ্বেলে , ফুল চড়িয়ে মীলাদ-মাহফিল বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান পালন করে আমাদের লোকসান ব্যতীত কোনো লাভ হবে না।

৫ চাহারাম : মৃত ব্যক্তির যে স্থানে দম যায় সেই স্থানে কয়েকদিন ধরে রূহ ঘুরাফিরা বা যাতায়াত করে এমন ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত ও বিদআত ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সেই অলীক ধারণা মতে সে স্থানে কয়েকদিন যাবৎ মাটি লেপা, বাতি জ্বালানো, ধূপধুনো দেয়া এবং মৃত্যুর চতুর্থ দিনে অথবা আগেপিছে কোনো দিন নির্দিষ্ট করে হুজুর ডেকে মীলাদ পড়ে গোশত-ভাত বা মিষ্টি-মিঠাই বিতরণ করে রূহ তাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয় অনেক বাড়িতে। এই আচার ও অনুষ্ঠান 'চাহারাম' নামে পরিচিত। বিদআতের সংজ্ঞার্থ যারা জানেন, তাঁরা জানেন যে, এ অনুষ্ঠানটিও বিদআত। যেহেতু এটি অমূলক ধারণাবশতঃ কৃত এমন

একটি আচার, যার কোনো প্রকার সমর্থন শরীয়তে পাওয়া যায় না।
চালশে

৬ (চেহলাম) : কোনো আত্মীয়ের মৃত্যুর চল্লিশতম দিনে তার নামে ভোজ-অনুষ্ঠান , মীলাদ-পাঠ বা দুআ-মজলিস করা ইসলামী শরীয়তে অনুমোদন নেই। তাই ইসলামের নামে এ সব করা সম্পূর্ণ বিদআত। আসলে এ প্রথাও কিন্তু বিজাতীয় প্রথা। (আমেরিকার) ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা অনুরূপ প্রথা ঐ দিনেই পালন করে থাকে। যেমন পুরনো যুগে মিসরীয় কাফেররা উক্ত প্রথা যথাযথ পালন করত।

বলা বাহুল্য যে, মৃতব্যক্তির আত্মার কল্যাণের জন্য তার মৃত্যুর দিন কিংবা এক সপ্তাহ পর অথবা ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ কিংবা চল্লিশ দিন অথবা বছর পার হলে কোনো প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা বিদআত। (ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ১/১২০-১২১) বলা বাহুল্য যে, আনুষ্ঠানিকভাবে দুআ করে অথবা বিরাট ভোজ-অনুষ্ঠান করে কোনো ফায়েদা নেই। তাতে যদি সমাজের কাছে নাম নেয়ার কিংবা বদনাম থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে থাকে তাহলে তো মৃত ব্যক্তির কোনো কল্যাণই সাধিত হবে না।

হ্যাঁ, আপনি যদি আপনার পরলোকগত বাপ, মা বা অন্য কোনো আত্মীয়ের সত্যই কল্যাণ কামনা করেন, তাহলে আপনি তাই করুন, যাতে সত্যই কল্যাণ আছে। আর যাতে কল্যাণ লাভ হবে তা জানতে আমাদেরকে শরীয়তের সাহায্য নিতে হবে। আপনি আপনার আত্মীয়র জন্য দুআ করুন। বিশেষ করে ফরয সালাতের পশ্চাতে সালাম ফিরার আগে ও তাহাজ্জুদে তার জন্য দুআ করতে ভুল করবেন না। আপনার মা-বাপের জন্য আপনি নিজে দুআ করুন। আপনার মা-বাপের জন্য আপনার মতো দরদ কি অন্যকারো হতে পারে? আপনার মতো আর কারো দুআতে কি সে আন্তরিকতার ভরসা করতে পারেন। আর জেনে রাখুন যে, দুআ কবুলের সমস্ত শর্ত পূর্ণ থাকলে নিশ্চয় সে দুআ তার উপকারে আসবে। কুরআন মাজীদে মৃত্যে ব্যক্তির জন্য দুআ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (সূরা হাশর : আয়াত-১০)

প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মৃতব্যক্তির জন্য দুআ করেছেন। যেমন, জানাযার সালাত ও কবর যিয়ারতের বিভিন্ন দুআ। যার প্রায় সবটাই মাইয়্যেতের জন্য দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনায় পূর্ণ। পরন্তু মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথাও বলেছেন, ‘‘মুসলিম ব্যক্তির কোনো ভাইয়ের জন্য তার অদৃশ্যে থেকে দুআ কবুল হয়। দুআকারীর মাথার উপর এক ফেরেশতা নিয়োজিত করেছেন। যখনই দুআকারী তার (অদৃশ্য বা অনুপস্থিত) ভায়েরজন্য দুআ করে, তখনই উক্ত ফেরেশতা বলেন, ‘আমীন। আর তোমরা জন্যও অনুরূপ।’’ (মুসরিম ২৭৩৩, আবু দাউদ ১৫৩৪ নং প্রমুখ)

আপনার আত্মীয়ের আপনিই অভিভাবক বা ওয়ারেস হলে এবং সে নযর-মানা রোযা রেখে মারা গেলে আপনি তার পক্ষ থেকে কাযা রেখে দেন, তার সাওয়াব তার উপকারে আসবে। প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ‘‘যে ব্যক্তি রোযা কাযা রেখে মারা যায় সে ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার অভিভাবক (বা ওয়ারেস) রোযা রাখবে।’’ (বুখারী ১৯৫২, মুসলিম ১১৪৭ নং, প্রমুখ)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ‘এক মহিলা সমুদ্র-সফরে বের হলে সে নযর মানল যে , যদি আল্লাহ তাবারাকা তাআলা তাকে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ দান করেন, তাহলে সে একমাস রোযা রাখবে। অতঃপর সে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ফিরে এল। কিন্তু রোযা না রেখেই সে মারা গেল। তার এক কন্যা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে সে ঘটনার উল্লেখ করলে তিনি বললেন, ‘‘মনে কর, তার যদি কোন ঋণ বাকি থাকত, তাহলে তা তুমি পরিশোধ করতে কি না?’’ বলল, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, ‘‘তাহলে আল্লাহর ঋণ অধিকরূপে পরিশোধ-যোগ্য। কাজেই তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে রোযা কাযা করে দাও।’’ (আবু দাউদ ৩৩০৮ নং ,আহমাদ ২/২১৬ প্রমুখ)

রমযানের রোযা কাযা রেখে মারা গেলে তার বিনিময়ে আপনি ফিদিয়া (প্রত্যেকদিনের পরিবর্তে একটি মিসকীনকে একদিনের খাদ্য অথবা ১ কিলো ২৫০ গ্রাম করে চাল) দিন। তার সাওয়াবও মাইয়্যেতের জন্য উপকারী। জনৈক সাহাবীর মা রমযানের রোযা বাকি রেখে ইন্তিকাল করলে তিনি মা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমি আমার মায়ের পক্ষ থেকে কাযা করে দেবে কি?’’ আয়েশা (রা) বললেন, ‘না।’ বরং তার পক্ষ থেকে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে এক একটি মিসকীনকে অর্ধ সা’ (প্রায় ১ কিলো ২৫০ গ্রাম খাদ্য) সদকা করে দাও।’ (ত্বাহাবী ৩/১৪২, মুহাল্লা ৭/৪, আহকামুল

জানাইয, টীকা ১৭০)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 'কোনো ব্যক্তি রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং তারপর রোযা না রাখা অবস্থায় মারা গেলে তার পক্ষ থেকে মিসকীন খাওয়াতে হবে; তার কাযা নেই। পক্ষান্তরে নযরের রোযা বাকি রেখে মারা গেলে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক (ওয়ায়েস) রোযা রাখবে।' (আবূ দাউদ ২৪০১ নং প্রমুখ)

আপনার আত্মীয় হজ করার নযর মেনে মারা গেলে, অথবা হজ ফরয হওয়ার পর কোনো ওযরে না করে মারা গেলে আপনি (নিজের ফরয হজ আগে পালন করে থাকলে) তার পক্ষ থেকে তা পালন করে দিন। এর সাওয়াবেও সে লাভবান হবে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা:) এর নিকট এসে বলল, 'আমার বোন হজ করার মান্নত করে মারা গেছে। (এখন কি করা যায়?) নবী করীম (সা:) বললেন, ''তার ঋণ বাকি থাকলে কি তুমি পরিশোধ করতে? লোকটি বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, ''তাহলে আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করে দাও। কারণ, তা অধিক পরিশোধ-যোগ্য। '' (বুখারী ৬৬৯৯)

অনুরূপ এক মহিলা বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা অতি বৃদ্ধ। তার ফরয হজ বাকি আছে। এখন সাওয়ারীতে বসে থাকতেও সে অক্ষম। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ আদায় করে দেব? নবী করীম (সা:) বললেন, ''হ্যাঁ।' তাই কর।'' (মুসলিম ১৩৩৪-১৩৩৫ নং প্রমুখ)

অবশ্য ফরয হওয়া সত্ত্বেও যে বিনা ওজরে সময়ের অবহেলা করে হজ না করে মারা গেছে তার পক্ষ থেকে হজ আদায় কোনো কাজে দেবে না। (আহকামুল জানাইয ১৭১ পৃ: টীকা)

আপনি বেশি বেশি নেক কাজ করুন, তাহলে আপনার মৃত পিতামাতাও উপকৃত হবেন। কারণ, মাইয়্যেতের ছেড়ে যাওয়া নেক সন্তান যে নেক আমল করে তার সাওয়াবের অনুরূপ সাওয়াব লাভ হয় না তার পিতা-মাতারও। এতে সন্তানের সাওয়াবও মোটেই কমতি হয় না। কারণ, সন্তান হলো পিতা-মাতার আমলকৃত ও উপার্জিত সম্পদের ন্যায়। আর আল্লাহ তাআলা বলেন- এবং মানুষ তাই পায় ; যা সে করে। (সূরা নাজম: আয়াত-৩৯) আল্লাহর রাসূল (সা:) বলেন, ''মানুষ সবচেয়ে হালাল বস্তু যেটা ভক্ষণ করে তা হলো তার নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য। আর সন্তান হলো তার নিজ উপার্জিত ধনস্বরূপ।'' (আবূ দাউদ ৩৫২৮, তিরমিযী ১৩৫৮, নাসাঈ ৪৪৬৪ ইবনে মাজাহ ২১৩৭ প্রমুখ)

তাই সন্তান যদি তার পিতা-মাতার নামে দান করে অথবা ক্রীতদাস মুক্ত করেন তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার অনুপস্থিত থাকা কালে আমার মা মারা গেছেন। এখন যদি তার পক্ষ থেকে কিছু দান করি তাহলে তিনি উপকৃত হবেন কি?" নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "হ্যাঁ হবে।" সা'দ বললেন, 'তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, আমার মিখরাফের বাগান তাঁর নামে সদকা করলাম।' (বুখারী ২৭৫৬ প্রমুখ)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আস ইবনে ওয়াইল সাহমী তার পক্ষ থেকে ১০০টি ক্রীতদাস মুক্ত করার অসিয়ত করে মারা যায়। অতএব তার ছোট ছেলে হিশাম ৫০টি দাস মুক্ত করে। অতঃপর তার বড় ছেলে আমর বাকি ৫০টি দাসী মুক্ত করার ইচ্ছা করলে বললেন, 'বাপ তো কাফের অবস্থায় মারা গেছে। তাই আমি এ কাজ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা না করে করব না।' সুতরাং তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি বাকি ৫০টি দাস তার পক্ষ থেকে মুক্ত করব?' উত্তরে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "সে যদি মুসলিম হতো এবং তোমরা তার পক্ষ থেকে দাস মুক্ত করতে, অথবা সদকা করতে অথবা হজ করতে তাহলে তার সাওয়াব তার নিকট পৌঁছত।" (আবু দাউদ ২৮৮৩ নং, বাইহাকী ৬/২৭৯, আহমাদ ৬৭০৪)

তবে হ্যাঁ, দান খয়রাত করার বা মিসকীন খাওয়ানোর জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিন, ক্ষণ বা মজলিস করবেন না, অথবা তাতে নাম নেয়ার আশা পোষণ করবেন না। নচেৎ ভিক্ষার আপনার আত্মীয়ের কোন কাজ হবে না। বলা বাহুল্য, উত্তম হলো

গোপনে দান করা। যাতে আপনি মনের ঐ প্রশংসা-বাসনা থেকে দূরে থাকতে পারেন। এ ছাড়া মাইয়্যেতের ছেড়ে যাওয়া স্বীকৃত প্রবাহমান ইচ্ছাপূর্ত কীর্তিকর্ম (সদকায়ে জারিয়াহ); যেমন, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ , কল-কুঁয়া প্রভৃতি তৈরি, উপকারী গ্রন্থ প্রণয়ন প্রভৃতি; যে সব কীর্তির উপকারিতা দীর্ঘস্থায়ী বহমান থাকে- সে ধরনের নিজের কর্মফল মৃত মধ্যজগতেও ভোগ করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন- “ইন্না-নাহ্নু নুহিয়ল্ মাওতা অনাকতুবু মা-ক্বদ্দামূ ওয়া আসা-রাহুম অকুল্লা শাইয়িন আহস্বইনা-হু ফী ইমা-মিম মুবীন।”

অর্থাৎ, আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং লিপিবদ্ধ রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে ও যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়। আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট গ্রন্থে সংরক্ষিত রেখেছি। (সূরা ইয়াসীন : আয়াত-১২) প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “মানুষ মারা গেলে তিনটি জিনিস ব্যতীত তার আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; সদকায় জারিয়াহ, ফলপ্রসূ ইল্ম (শিক্ষা) এবং নেক সন্তান; যে তার জন্য দুআ করে।” (মুসলিম ১৬৩১, আবু দাউদ ২৮৮০, নাসাঈ ৩৬৫৩ নং প্রমুখ)

তিনি আরো বলেন, “মরণের পরেও মুমিনের যে আমল ও নেকী তার সাথে মিলিত হয় তা হলো; এমন ইলম যা সে শিক্ষা করেছেন এবং প্রচার করেছে, তার ছেড়ে যাওয়া নেক সন্তানও মুসহাফ (কুরআন শরীফ) তার নির্মিত মসজিদ ও মুসাফিরখানা, তার খননকৃত নালা বা ক্যানেল এবং তার মালের সদকা যা সে তার সুস্থ ও জীবিত থাকা অবস্থায় দান করে গেছে।” (ইবনে মাজাহ ২৪২ নং)

এ কথা স্পষ্ট যে, নিজের হাতে করে যাওয়া নেকীতেই লাভের আশা করা যায়। তাছাড়া অপরে যে ঠিকমত ঈসালে সাওয়াব করবে তার ভরসা কোথায়? পক্ষান্তরে শরীয়ত অনুমোদিত ছাড়া অন্যান্য আমল বা পদ্ধতি দ্বারা ঈসালে সাওয়াব করলে তা বেসরকারি ডাকে প্রেরণ হবে যা সঠিক ঠিকানায় পৌঁছবে না। সুতরাং মাইয়্যেতের পক্ষ থেকে তওবা করা, সালাত পড়া, নিজের অথবা ভাড়াটে ক্বারীদের কুরআনখানী, ফাতিহাখানী, কুলখানী, শবীনা পাঠ, চালশে, চাহারম, নিয়মিত বাৎসরিক দুআ মজলিস ইত্যাদি কোনো মতেই ঈসাল বা ‘রিসিভড’ হবে না। (আহকামুল জানাইয, মু’জামুল বিদ্যা’ ১৩৫ পৃঃ)

পরিশেষে জেনে রাখা উচিত যে- নাস্তিক , কাফের, মুশরিক, মুনাফিক ও বেনামাযী, যারা কবরের আযাব ও জান্নাত-জাহান্নাম কিছুই বিশ্বাস করে না, তাদের নামে যদি কোনো শরীয়ত সম্মত ঈসালে সাওয়াব করা হয়, তাহলেও তা তাদের কোন কাজে আসবে না। সুতরাং বিদআতী ঈসালে সাওয়াব, কুরআন-খতম , ফাতিহাখানী, কুলখানী, চালশে, চাহারম, দুআ মজলিস, মীলাদ-মাহফিল , ভোজ অনুষ্ঠান ইত্যাদি তাদের কোনো কাজে আসতে পারে? যাদের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ছিল না, তাদের নামে ধর্মব্যবসায়ীদের নকল ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ছিল না, তাদের নামে ধর্মব্যবসায়ীদের নকল ধর্মের ধর্মীয় আচার কেন? যাদের পরকালে বিশ্বাস নেই, তাদের পারলৌকিক কল্যাণ বা মুক্তির জন্য এ লৌকিকতা ও আনুষ্ঠানিকতা কেন? এ সব আচার পালনের মাধ্যমে কেবল ছেলেদের বদনাম থেকে বাঁচার, অথবা নাম নেয়ার, অথবা সামাজিক ও প্রথাগত কর্তব্যভার হাল্কা করার, অথবা ভোট নেয়ার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না তো?

৭ ফাতেহা ও কুলখানী : কোনো প্রিয়জনের নামে, তার আত্মার কল্যাণের জন্য, তার পরকালে মুক্তি লাভের আশায় মরণের ৩ দিন পর অথবা অন্য কোনো দিনে হুজুর, মুন্সী, মুসল্লী দাওয়াত দিয়ে ঘরে এসে অথবা মসজিদ মাদরাসায় ৭০ হাজার বার কালেমা ত্বাইয়েবা পাঠ বা ফাতিহাখানী অথবা কুলকানী করিয়ে মৃতের নামে ঈসালে সাওয়াব করা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণে বুট বা ছোলা দিয়ে একবার পড়া হলে একটি করে ছোলা সরিয়ে রাখা হয়। সবশেষে থাকে মুনাজাত ও খানাপিনার ব্যবস্থা।

ঈসালে সওয়াবের এমন পদ্ধতি যেহেতু মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবাদের যুগে ছিল না, সেহেতু তা বিদআত বিধায় তা একান্ত বর্জনীয়।

৮ শবীনা ও কুরআনখানী : বহু মুসলমান কর্তৃক বরকত ও সাওয়াবের আশায় এক রাত্রি ব্যাপী কুরআন খতমের মসলিস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। হাফেয অথবা হুজুররা দেখে দেখেই খতম করে থাকেন। কোনো কোনো মজলিসে এক এক হাফেয বা

মৌলবী সাহেবকে কুরআন মাজীদের অংশ ভাগ করে তা পাঠ করার দায়িত্ব দেয়া হয়। কেউ কেউ কিছু অংশ পড়ে কিছু অংশ বাদ দিয়ে নিজের ভাগ শেষ করে থাকেন।

মাইকযোগে সারা রাত ঝড়ের গতিতে কুরআনখানী চলে। কয়জন আল্লাহর বান্দাই বা তা যথোচিত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে? অতিরিক্ত শব্দে বহু মানুষের কাছে কুরআন অবহেলিত হয়। অনেকের অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাড়ায়। ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটে, রোগ-পীড়িত মানুষের মনে আঘাত লাগে , আরাম ও ঘুম জরুরি এমন মানুষের মনে বিরক্তি সৃষ্টি করে, অমুসলিমদের মনে সৃষ্টি করে বিতৃষ্ণা। সত্যই তো যে বাণী বুঝাই যায় না, সে বাণীর প্রতি কর্ণপাত করবে কয়জন?

খতম শেষে হাত তুলে জামাআতী দুআ হয়। খাওয়া-দাওয়ার ধুমও থাকে বেশ জোরালো। এতে যা খরচ হয়, তা একেবারেই কম নয়। কিন্তু এসব তো করা হয় কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়। তবে হয়তো বা খতমদাতা জানে না যে, সত্যপক্ষে এ কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি নেই। যেহেতু এ কাজ তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী হয় না তাই। ভাড়াটিয়া হাফেয-হুজুরদের এ কুরআনখানীতে কোনো সাওয়াবাও নেই; না তাঁদের, না খতমদাতার। কারণ, তাঁরা পড়েন কিছু রোজগারের জন্য। আর খতমদাতার সওয়াব হয় না, যেহেতু তা বিদআত। (মাজমূউল ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৩০৪)

যে হাফেয বা হুজুরদেরকে নিয়ে খতম পড়ানো হয়, কিন্তু তাঁরা তো কোনোদিন ঐরকম খতম পড়ান না। যাঁরা মীলাদ পড়ে অর্থ উপার্জন করে বেড়ান, কিন্তু তাঁরা তো কোনোদিন খরচ করে মীলাদ পড়ান না? নাকি শিষ্যের ঘরের চালে কাক বসে শিষ্যের পাপের কারণে। আর গুরুর ঘরের চালে কাক বসে কাকের পাপ ক্ষয় করার জন্য, বুদ্ধিমান মানুষরা বুঝে না কেন? অনেকে ফাতেহাখানী, কুরআনখানী প্রভৃতি করে তার সাওয়াব তাঁদের জন্য (যেমন আম্বিয়াদের নামে) বখশিয়ে দেয়া- যাঁরা সাওয়াবের মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং এমন কাজ বিদআত ও নিষ্ফল ব্যতীত কিছু নয়?

পক্ষান্তরে অন্যান্য আমল বা পদ্ধতি দ্বারা ঈসালে সাওয়াব করলে তা বেসরকারি ডাকে ইরসাল হবে যা সঠিক ঠিকানায় পৌঁছবে না। সুতরাং মাইয়্যেতের পক্ষ থেকে তওবা করা, নামায পড়া, নিজের অথবা ভাড়াটে চাহারম, নিয়মিত বাৎসরিক দুআ মজলিস ইত্যাদি কোনো মতেই ঈসাল বা 'কবুল' হবে না। (আহকামুল জানাইয, মু'জামুল বিদা' ১৩৫ পৃঃ)

ভাড়াটিয়া কারীর কুরআনখানী, ফাতেহাখানী, কুলখানী, শবিনাখানী, চালসে চাহারম, মীলাদ পাঠ ইত্যাদি যা ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয় তা সমস্ত বিদআত। এসব মৃতের কোনো কাজে আসে না। উপরন্তু মৃত ব্যক্তির যদি নাস্তিক বা কাফের অথবা মুশরিক হয়, তাহলে তার আত্মার কল্যাণ উদ্দেশ্যে এমন দুআ মজলিস করা বা দুআ করাই হারাম। (সূরা তাওবাহ : আয়াত-১১৩)

মুফতী মুহাম্মদ শফী' সাহেব মাআরিফুল কুরআনে বলেন, 'ঈসালে সাওয়াব উপলক্ষে খতমে-কুরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে না-জায়েয।

আল্লামা শামী 'দুররে মুখতারের শরাহ' এবং 'শিফাউল আলীল' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এবং অকাট্য দলীলাদিসহ এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, কুরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তীকালের ফকীহগণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যে, তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরীয়তের বিধান-ব্যবস্থার মূল্যে আঘাত আসবে। কাজেই এ অনুমতি এ সব বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একান্তই অবশ্যক। এ জন্যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃত্যের ঈসালে-সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করানো বা অন্য কোনো দোয়া-কালাম বা অযিফা পড়ানো হারাম। কারণ এর উপর কোনো ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। এখন যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন পড়া হারাম, সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়বে, তারা উভয়ই গুনাহগার হবে।

বস্তুতঃ যে পড়েছে সেই যখন কোনো সাওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি পৌঁছাবে? কবরের পাশে কুরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন খতম করানোর রীতি সাহাবী, তাবেয়ীন এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা

কোথাও বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বেদ'আত। (তফসীর মাআরিফুল কুরআন, বাংলা অনূদিত সউদী আরব ছাপা ৩৫ পৃঃ)

আল্লাহর অলী আল্লাহর বন্ধু। তাঁরা আল্লাহর সাথে শিরক অবশ্যই পছন্দ করেন না, করতে পারেন না। তাঁরা শিরক সম্বন্ধে মানুষকে সতর্ক করে থাকেন। তাঁদের ইন্তিকালের পর তাঁদেরকে কেন্দ্র করে কোনো শিরক হোক তা তাঁরা কোনোক্রমেই চাইতে পারেন না। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, মানুষ তাঁদেরকে ভুল বোঝে এবং তাঁদেরকে নিয়ে তাই শুরু করে দেয়, তা তাঁরা তাঁদেরকে পছন্দ করেন না; পছন্দ করেন না তাঁদের একমাত্র মা'বূদ মহান আল্লাহ।
মানুষ মারা গেলে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। মধ্যজগতে না কোনো নামায থাকে, না কোন দুআ। আর না থাকে সে জগতের মানুষের সাথে এ জগতের মানুষের কোনো সম্পর্ক। আউলিয়া হলেও তাঁরা সে জগৎ থেকে এ জগতের কোনো আহ্বান শুনতে পান না, পারেন না কারো আহবানে সাড়া দিতে। তবুও মানুষ নিজের প্রয়োজনে সরাসরি মহান প্রতিপালক ও একক মা'বূদকে না ডেকে কোনো অলীকে মাধ্যম করে, এ মনে করে যে তিনি আর দুআ আল্লাহর দরবারে পৌঁছে দেবেন। কিন্তু সে ধারণা যে আদৌ সঠিক নয় তা মাত্র অল্প লোকেই বোঝে।
আল্লাহকে ভুল বুঝে এবং তাঁর আউলিয়াদের প্রতি ভক্তির আতিশয্যে লোকে তাঁদের কবরের কাছে একত্রিত হয়। বৎসরান্তে একবার সেখানে বড় ভক্তি ও আগ্রহের সাথে ভক্তরা নিজ নিজ নযর-নিয়ায ও হাদিয়া-উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে কামনা-বাসনা পূর্ণ হওয়ার আশা করা হয়। মহাঘটা ও সমারোহের সাথে অনুষ্ঠিত হয় উরস-উৎসব।

উরসে ঐ কবর যিয়ারাতে অতীব পুণ্যলাভ হওয়ার আশা করে লোকে, ''করযে আম' অর্জন করার আশা পোষণ করে, নফল রোযা রেখে মাযার যিয়ারত করে। উৎসব-মুখর ঐ স্থানে মেলা বসে! আল্লাহর আউলিয়া যা পছন্দ করেন না তাই হয় সেখানে। কোনো কোনো উরস-মেলায় গান-বাজনা হয় , নাটক যাত্রা, সিনেমা, সার্কাস এবং আরো অন্যান্য চিত্তরঞ্জনমূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ঘটে। প্রদর্শিত হয় নারীর সেই রূপ ও সৌন্দর্য যা দেখা ও দেখানো অবৈধ। শিরক-বিদআত ও কাবীরা গুনাহ পরিবেষ্টিত এমন পরিবেশ কি আল্লাহর কোনো অলী পছন্দ করতে পারেন? তবুও এমন শিরকী ও বিদআতী মেলায় অংশগ্রহণ করে বহু ভক্ত অর্থ ব্যয় করে থাকে। কিন্তু বড় দুঃখ হয় সেই ভক্তদের দেখে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ উপার্জন করে তা নিজের মা-বাপ ও স্ত্রী-পরিজনের উপর খরচ না করে লুটিয়ে আসে ঐ পাপের মেলায়! আর সেই সাথে শিরক, বিদআত তথা কবীরা গুনাহের মতো 'ফরয' তরক করে পাথেয় হাসিল ও সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরে।

দূর-দূরান্ত থেকে এক এক আশা নিয়ে লোকেরা অলীর মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করে; অথচ তা ইসলামে বৈধ নয়। বৈধ নয় কোনো কিছু কেনা-বেচার জন্যও এমন মেলায় উপস্থিত হওয়া। 'উরস' কথাটি আরবি হলেও তার আসল অর্থ বিবাহ-অনুষ্ঠান ও তার ভোজ-উৎসব। কিন্তু পরবর্তীতে লোকেরা তাকে নৈবেদ্য চড়ানো অনুষ্ঠানের অর্থে ব্যবহার করে বাৎসরিক মেলার আয়োজন করে অলীর নামে নৈবেদ্য চড়িয়ে থাকে। আর সে সাথে 'উরস মুবারক' বা 'উরস পাক' নামকরণ করে তাকে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রূপদান করা হয়। অথচ ধর্মের সাথে এ অনুষ্ঠানের নিকট অথবা দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই।

৯ ফাতিহা-ই-ইয়ায-দহম : শায়খ আব্দুল কাদের জ্বিলানী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর উপলক্ষ্যে এই দিন পালিত হয়। ফরাসী ভাষায় 'ইয়াযদহম' মানে ১১তম। যেহেতু রবিউস সানী মাসের ১১ তারিখে তাঁর ওফাত হয় সে জন্য এই দিনটিকে 'ফাতিহা ইয়াদহম' নামে স্মরণ ও পালন করা হয়। ১১ তারিখের রাতে তাঁর নামে কুরআন-খতম ও মীলাদ মাহফিল করে লোকেরা 'ফয়েজ' অর্জন করে থাকে।

আমরা জানি যে, ইসলামে ব্যক্তিপূজার কোনো স্থান নেই। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্মমৃত্যুদিবস পালন করা বিদআত। সুতরাং তাঁরপরে আর কার জন্ম-মৃত্যুদিবস পালন করা বিধেয় হতে পারে? তাছাড়া তাঁর নামে যা করা হয় তাও তো বিদআত। বলা বাহুল্য, ঐ দিনে ছুটি ঘোষণা বা কাজ-কর্ম বন্ধ করে হালুয়া-রুটি খেয়ে আনন্দ করা শরীয়তসম্মত কাজ নয়।

১০ ফাতিহা-ই-দোয়াজ-দহম : ইসলামী দুনিয়ায় রবিউল আউয়ালের বারো তারিখটি ফাতেহা-ই দোয়াজ-দহম নামে বিশেষভাবে পরিচিতি। ফাতিহা আরবি শব্দ। এর অর্থ দোয়া করা, সাওয়াব রেসানী করা, মোনাজাত করা। আর দোয়াজ-দহম ফার্সি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে বারো। সুতরাং ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম বাক্যটির সম্মিলিত অর্থ হচ্ছে, বার তারিখের দোয়া, মোনাজাত বা সাওয়াব রেসানী। প্রকাশ থাকে যে, এখানে বারো বলতে রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এই দিন কুরআনখানি করা, দরূদ শরীফ পাঠ করা, নফল ইবাদত-বন্দেগী করা , তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করা, রাসূলের কর্ম ও জীবনী নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা , রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চরিত্র ও আদর্শ বর্ণনা করা, শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা এবং এগুলোর সাওয়াব রাসূল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র রূহের উপর বখশে দেয়া প্রতিটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য বলে মনে করা হয়ে থাকে।

আরবি ভাষায় 'রবিউন' শব্দের অর্থ হচ্ছে বসন্ত, সঞ্জীবনী, সবুজের সমারোহ। রবিউল আউয়াল বলতে প্রথম সঞ্জীবনের মাস বুঝায়। কারণ মক্কার কাফের কোরাইশ সম্প্রদায় অনাবৃষ্টি ও অভাবের কালে কঠিন বিপদের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করছিল। যে বছর রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মা আমেনার গর্ভে তাশরীফ আনয়ন করলেন, সেই বছর মক্কার উষ্ণ শুষ্ক মরুভূমি সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। শুষ্কবৃক্ষ তরতাজা ও ফুল-ফলে ভরে গেল। চতুর্দিকে একটা শান্তির অমীয় বাণী ও আনন্দের ধারা বয়ে যেতে লাগল। মক্কার কোরাইশেরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে এ বছরকে নাম দিয়েছিল খুশি, আনন্দ এবং সঞ্জীবনের বছর। সর্বোপরি রবিউল আউয়ালের সে সঞ্জীবনের ধারা নিয়ে পৃথিবীর বক্ষে আবির্ভূত হয়েছিলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। সঙ্গত কারণেই মুসলমানদের নিকট ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম এত প্রিয় ও সম্মানিত দিন। এ দিবসটি সম্মানিত ঠিক, কিন্তু এটাকে ইবাদাত বলে এ উপলক্ষে বিশেষ মাহফিলের আয়োজন করা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

১১ মুসলমানি (খাৎনা) উৎসব : ইসলামে মুসলিম পশুর খাৎনা বা মুসলমানি (লিঙ্গত্বকচ্ছেদ) করা বিধেয়। এতে বহু যৌনরোগের হাত থেকে মুক্তির উপায় রয়েছে। তাছাড়া এতে রয়েছে দাম্পত্য সম্ভোগ-সুখের পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও রহস্য। এটা মানুষের এক সুরুচিপূর্ণ প্রকৃতি। তারই উপর রয়েছে ইসলামের সুন্দর স্বাস্থ্যবিধান।

তবে যে লিঙ্গত্বকহীন অবস্থায় জন্মেছে, তার খাৎনা নেই এবং তার লিঙ্গের উপরে ক্ষুর বা চাকু বুলানো অথবা পান কাটা ইত্যাদি আচার বিধেয় নয়; বরং তা অতিরিক্ত বিদআত কাজ। তবে বাড়তি ঐ চামড়ার কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকলে তা কেটে ফেলা দরকার। অনুরূপভাবে যদি কোন শিশু খুব দুর্বল হয় অথবা কেউ বৃদ্ধ অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং খাৎনা করায় কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে তাদের জন্য তা জরুরী নয়।

খাৎনা করার কোনো বাঁধা-ধরা সময় নেই। তবে কৈশরের পূর্বে করাটাই উত্তম। যাতে বড় হয়ে লজ্জা স্থান দেখাতে না হয়। আর এ জন্যই খাতনার সময় নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে বিয়ের মতো অনুষ্ঠান করে সকলের সামনে লিঙ্গত্বকে কাটা বৈধ নয়। (মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ ১৪/১২) বৈধ নয় খাৎনার জন্য শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, উপহার নেয়া এবং সেই সাথে গান-বাজনা পটি মেয়েদের বাজনাসহ গীত গাওয়া, নাচা ও কাপ (নাটক) করা। শিশুকে সুসজ্জিত করে রিক্সা পাল্কি বা ঘোড়ায় বসিয়ে পাড়া, গ্রাম বা শহর ঘুরানো এবং সে সাথে আলো ও গান-বাজনার সুব্যবস্থা করা, রঙ মাখামাখি করা, দিবারাত্রি মাইকে রেকর্ড বাজিয়ে সি-ডি অথবা ভিডিওর মাধ্যমে ফিলম প্রদর্শন মহল্লা বা গ্রামকে উৎসব-মুখর করে তোলা , কত লোকের সমস্যার ও কত লোকের ইবাদতের ক্ষতি করা, কত যুবক-যুবতীকে অবাধ-মেলামিশার সুযোগ করে দেয়া , ফিম-প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের চরিত্র কুলষিত করা অন্তত:পক্ষে একজন পূর্ণ ঈমানদার মুসলিমের কাজ হতে পারে না।

লজ্জাস্থানের এক টুকরো চামড়া কেটে ফেলার সময় গোপনীয়তা ও লজ্জাশীলতাই থাকা প্রয়োজন সকলের মনে। এর জন্য আনন্দ উৎসব করা সুরুচিপূর্ণ সভ্য পরিবেশের কাজ নয়। বাকি থাকল এ উপলক্ষ্যে আত্মীয়-স্বজন ও মিসকীনদেরকে কেবল দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর কথা। যাঁরা দাওয়াত দেয়া ও খাওয়া জায়েয মনে করেন, তাঁরা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর কর্মকে দলীল মনে করেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর ছেলেদের খাৎনার সময় ভেঁড়া যবাই করে খাইয়েছিলেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ১৭১৬০, ১৭১৬৪ নং)

পক্ষান্তরে খাৎনা বা মুসলমানী উপলক্ষ্যে দাওয়াত দেয়া ও খাওয়া আল্লাহর রাসূল (সা:) এর যুগে ছিল না বলে বর্ণনা দিয়েছেন সাহাবী উসমান বিন আবুল আস। একদা তাঁকে খাৎনা-ভোজের দাওয়াত দেয়া হলে তিনি তা কবুল করতে অস্বীকার করলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (সা:) এর যুগে খাৎনা-ভোজে হাযির হতাম না। তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (সা:) এর যুগে এটাকে বৈধ মনে করতাম না। অত:পর তিনি সে দাওয়াত খেতে অস্বীকার করলেন। (আহমদ ৪/২১৭, ত্বাবারানীর কাবীর ৯/৫৭)

আর এ জন্য বহু আলেম-ওলামা বলেন , খাৎনার দাওয়াত বিদআত। উলামা আহলে হাদীসের ফতোয়ায় বলা হয়েছে, খাৎনা করার সময় যিয়ারত বিদআত। (ফাতাওয়া আহলে হাদীস ২/৫৪৯) বলা বাহুল্য যে, হুজুরদেরকে দাওয়াত দিয়ে ঐ দিনে বা তার আগের দিনে নসীহত করা অথবা মীলাদ পড়া অত:পর উদরপূর্তির অনুষ্ঠান করাও বিদআত।

১২ ব্যাঙের বিয়ে : এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা মাদারের বিয়ে দিয়ে থাকে এবং মাদারতলা নির্বাচিত করে মাটির হাতি-ঘোড়া পেশ করে সেখানে ধূপ-মোমবাতি জ্বালিয়ে পূজা করে থাকে! প্রতিবেশীর পরিবেশ দ্বারা তারা এতই প্রভাবান্বিত যে, তাদের পূজার আনন্দ দেখে আর লোভ সামলাতে না পেরে পূজার মৌসুম আবিষ্কার করে পূজার ধূম মাচিয়ে থাকে। (ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

অন্য এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা ধর্মকে খেল-তামাশার বিষয় মনে করে থাকে। আকাশে বৃষ্টি না হলে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষেরা যেখানে নিজ প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করে কেউ বা কাকুতি-মিনতি সহকারে দুআ করে কান্নাকাটি করে, কেউবা ইস্তিগফার করে এবং অনেকেই ইস্তিস্কার নামায পড়ে থাকে। হাত দুটিকে খুব উঁচু করে তুলে সৃষ্টিকর্তা বৃষ্টিদাতার নিকটে বৃষ্টিবর্ষণের জন্য আকুল আবেদন জানিয়ে থাকে। সেখানে ঐ শ্রেণীর মানুষেরা বৃষ্টির জন্য রাগী লোকের চুলো ভেঙ্গে আসে অথবা তার গায়ে ময়লা ফেলে দেয়। আর ভাবে যে, সে রেগে গালাগালি করলেই আকাশে মেঘ আসবে, বৃষ্টি হবে, ফসল ফলবে!

অনুরূপ নারী-পুরুষ একত্রে উপহাসের পাত্র-পাত্রীরা খেল খেললে , আপোসে রঙ কিংবা কাদা মাখামাখি করলে বৃষ্টি হবে মনে করে আর এক শ্রেণীর মূর্খ মানুষ।অনেক মুশরিক জাহেল এরূপ ধারণা ও বিশ্বাস রাখে যে, কোলো ব্যাঙের বিয়ে দিলে আল্লাহ খুশী হয়ে বৃষ্টি দেবেন! আর সেই জাহেলী ধারণামতে ব্যাঙ ধরে তেল-হলুদ মাখিয়ে কাপড় পরিয়ে আলমতলায় বসিয়ে গীত বাজনা করে ক্ষীর খাওয়ায়! কোনো কোনো এলাকায় গাধা-গাধীর বিবাহও দেয়া হয়! আসলে এই ফাঁকে তাদের আনন্দ করার একটি সুযোগ আর কি? কিন্তু আনন্দ করার অবকাশ তো অনাবৃষ্টির সময় নয়। এই সময়ে ধান হবে না এই আশঙ্কায় কত মানুষের চোখে ঘুম আসে না। আর এরা করে আমোদ-ফূর্তি! কারো পৌষমাস , কারো সর্বনাশ। কারো মোজ হয়, কেউ আমাশয় যায়। এমন জাহেলী ও শির্কী আনন্দে কোনো মুসলিম শরীক হতে পারে না। না ঐ জাহেলদেরকে জায়গা দিয়ে, আর না কোনো প্রকার চাঁদা দিয়ে। বরং আল্লাহর আদেশমতে আপনিও বলুন- ''ক্কুল জা-আল্ হাককক্কু অযাহাক্কাল্ বা-ত্বিল ইন্নাল বা-ত্বিলা কা-না যহুক্কা। '' অর্থাৎ, সত্য এসেছে মিথ্যার অবসান ঘটেছে নিশ্চয়ই মিথ্যার অবসান অনিবার্য। (সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত-৮১)

এমন মূর্খ স্ফূর্তিবাজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ করুন। যেহেতু নবী করীম (সা:) বলেন, ''তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোনো গর্হিত (শরীয়ত বিরাধী) কাজ হতে দেখবে, তখন সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তিত করে। তাতে সক্ষম না হলে যেন তার জিহ্বা দ্বারা, আর তাতেও সক্ষম না হলে তার হৃদয় দ্বারা (তা ঘৃণা জানবে)। তবে এ হলো সব চেয়ে দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।'' (মুসলিম ৪৯ নং, আহমদ, আসহাবে সুনান)

১৩ হানিমুন ও বিবাহ-বার্ষিকী : বিবাহ-বার্ষিকী বা বিবাহের তারিখে প্রত্যেক বছর দম্পতির নির্দিষ্ট আনন্দোৎসব পালন করা ইসলাম পরিপন্থী কর্ম পদ্ধতি। স্বামী-স্ত্রী সাজ-সজ্জার সাথে আনন্দ করা কোন দোষের কথা নয়। দোষ হলো নির্দিষ্ট করে বিবাহের দিনে প্রত্যেক বছর সেই প্রথা পালন করা, যা সাধারণতঃ বিজাতির। তদানুরূপ হানিমুন পালন করার প্রথাও ইসলাম বহির্ভুত। যাতে বিবাহের পরবর্তী প্রথম সপ্তাহ (অথবা এক সপ্তাহেরও বেশি দিন) নব-দম্পতী আত্মীয়-স্বজন হতে দূরে থেকে ছুটি উপভোগ করে; যাতে রয়েছে অস্বাভাবিক খরচ এবং অপব্যয়।

হালখাতা বা নতুন খাতা : অনেক মূর্খ মুসলিম ব্যবসায়ী মনে করে অথবাপ্রতিবেশীর দেখাদেখি বিশ্বাস করে যে, দোকান খোলার সময় ধূপ-ধুনো দিলে , দাঁড়াপাল্লায় ও দরজায় পানি ছিটালে, প্রথম বিক্রয়ের টাকা কপালে ঠেকিয়ে সালাম করলে, দোকানে কোনো তাবীয, কুরআনের আয়াত, কারো মূর্তি অথবা ছবি টাঙ্গিয়ে রাখলে দোকান ভালো চলবে বা ক্রেতা বেশি হবে।

অনেক দোকানদার বিভিন্ন বিষয়কে তার দোকান ও ব্যবসার জন্য অশুভ মনে করেথাকে; যেমন প্রথম ক্রেতা অমুক এলে সারাদিন ভালো যাবে না, প্রথমে দোকান খুলতেই বইনি না করে ধার দেয়া যাবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি। তদানুরূপ নববর্ষের শুরুতে 'হাল খাতা' বা 'নতুন খাতা' খোলার মাধ্যমে নববর্ষ উদযাপন করার সময় আমপাতা ও সিন্দুর দিয়ে দোকান সাজানো, মীলাদ পড়ানো, মিষ্টি বিতরণ করা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে দোকানের বরকতের আশা অথবা অধিকাধিক বেচা-কেনার আশা শিরক ও বিদআত।

নিঃসেন্দেহে ঐ সকল কাজের মধ্যে শিরক ও বিদআত রয়েছে যা কোনো মুসলিম করতে পারে না। তাছাড়া তা একটি বিজাতীয় প্রথামাত্র, তা পালন করতে বিজাতির মাঝে একাকার হওয়া মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। মুসলিমের একমাত্র ভরসাস্থল তার প্রতিপালক মহান আল্লাহ। তিনিই একমাত্র রিযিকদাতা। তাঁরই কাছে রুযী চাওয়া উচিত এবং সকল আশা তাঁরই কাছে করা উচিত। আর নিজের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে নিজেকে অপমানিত করা উচিত নয় কোনো মুসলিমের।

যদি কেউ বলেন, 'এই অবসরে ধার-বাকি আদায় করা সুবিধা হয় , তাহলে আমরা বলব যে, এসব বলে সেই সুবিধা লাভের জন্য শিরক বা বিদআত তো করা যায় না। অবশ্যই আপনার অর্থের থেকে আপনার ঈমানের মূল্য অনেক বেশি। অন্য কোনো পার্থিব পদ্ধতিতে ঋণ পরিশোধ নেয়ার ব্যবস্থা খুঁজুন। অথবা কেবল বকেয়া টাকা তোলার উদ্দেশ্যে অন্য একটা দিন নির্দিষ্ট করে ধার শোধ নিয়ে মিষ্টি খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। আল্লাহ আপনার ব্যবসায় বরকত দিন।

১৪ নবান্ন উৎসব : হৈমন্তী ধান কাটার পর অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠেয় নতুন চাল (নতুন চালের ভাত,) এঁকে (পিঠা, ক্ষীর) খাওয়ার (ও বিতরণ করার) উৎসব কিছু নামধারী মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে। অথচ এটি একটি বিজাতীয় প্রথা। পক্ষান্তরে ইসলামের নিয়ম হলো, নতুন ফল-ফসল দেখে একমাত্র রিযিক প্রতিপালক মহান আল্লাহর কাছে এই বলে দুআ করা-
উচ্চারণ: আল্লাহুমা বা রিক লানা ফী সামরিনা, অবারিক লানা ফী মাদীনাতিনা, অবারিকা লানা ফী সাইনা, অবারিক লানা ফী মুদ্দিনা। অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের ফল-ফসলে , শহরে পরিমাপে বরকত দান কর। (মুসলিম ১৩৭৩ নং) কিন্তু আনন্দ উপভোগ করার মানসে বিজাতির প্রথাকে ভালো মনে করে পালন করে থাকে এমন উৎসব; যা সত্যই দু:খজনক ও বেদনা দায়ক।

১৫ পৌষপার্বণ : এটি পৌষসংক্রান্তিতে (প্রধানত: নতূন চালের) পিষ্টকাদি প্রস্তুত করে দেবতাকে নিবেদন করার উৎসব। সুতরাং এ উৎসবে কোনো মুসলিমকে উৎসাহিত হতে দেখা এবং নিজ ঘরে নানা রকম পিঠা প্রস্তুত করে খেয়ে আনন্দবোধ করা আশ্চার্যের কথাই বটে। পৌষ মাসকে বিদায় দেয়ার মানসে শাঁক (শঙ্খ) বাহিয়ে শাঁকরাত পালন করে থাকে অনেক নামধারী মুসলমান। খুশী করার মানসে চোখ বন্ধ করে বিজাতির অনুকরণ কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। তাই বলে পিঠা খাওয়া যে মানা তা বলছি না। পিঠা তো যে কোনো দিনে খাওয়া যায়। তাহলে ঐ দিন কেন নির্দিষ্ট করা হয়?

১৬ জয়ন্তী বা জুবিলী : ফরাসী ভাষায় ঔঁনরষব, ল্যাটিন ভাষায় ঔঁনরধবঁং এবং বিব্রু ভাষায় ণড়নষব এই তিনের অর্থ যা, ইংরেজি ঔঁনরষবব অর্থও তাই। প্রামাণ্য ইংরেজি অভিধানে জুবেলী অর্থ করা হয়েছে এঁযব নষধং:: ড়ভ ধ:ৎধসঢ়বঃ ইষধং: অর্থ প্রবল বাত্যা, ঝঞ্জা, বিস্ফোরণ। আর এঁৎধসঢ়বঃ অর্থ ভেঁপু, ভেরীধ্বনী ইত্যাদি। আভিধানিক অর্থকে সামনে রেখে জুবিলী অর্থ হয়, মহোৎসব, মহা আনন্দ উৎসব ইত্যাদি।

রজব, সুবর্ণ ও হীরক জয়ন্তীর ইতিহাস যতটুকু জানা যায়, তা হচ্ছে এই- ১. সিলভার জুবিলী বা রজত জয়ন্তী: রোমান ক্যাথলিক গির্জাগুলোর প্রতি পঁচিশ বছর পর জাঁকজমকের সাথে ধর্মীয় অনুষ্ঠান উৎসব পালন করে থাকে। এ উৎসবের নাম তারা দিয়েছে, 'সিলভার জুবিলী।'
২. গোল্ডেন জুবিলী, সুবর্ণ বা স্বর্ণজয়ন্তী: পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ইহুদী কর্তৃক পালনীয় একটি উৎসব বিশেষ। এ সময়ে তারা ক্রীতদাসদেরকে (দাসত্ব থেকে) এবং ঋণদাতাদের (্ঋণ থেকে) মুক্ত করে পুণ্য লাভ করে। দ্বীন-দু:খীদেরও দান করে থাকে। ইহুদীরা এ অনুষ্ঠানকে মনে করে পাপ মুক্তির অনুষ্ঠান, অন্যদিকে তারা এটাকে আনন্দ অনুষ্ঠানও মনে করে থাকে।

৩. ডায়ম- জুবেলী বা হীরক জয়ন্তী: ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে আনন্দানুষ্ঠান। প্রথমে এক শ্রেণীর খ্রিস্টান (সম্ভবত: প্রোটেস্টান্ট) যাদের বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হতো, তারা হীরক জয়ন্তী পালন করত। পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠানের বয়স ৬০ বছর হলে সাড়ম্বরে এই অনুষ্ঠান পালন করতে থাকে। যে প্রথা বর্তমানেও প্রচলিত।

লক্ষ্যণীয় যে, উক্ত তিনটি জুবেলী অনুষ্ঠানের সাথে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক নেই। এটি রোমান ক্যাথলিকদের অনুষ্ঠান, অপরটি ইহুদীদের অনুষ্ঠান, তৃতীয়টিও খ্রিস্টানদের অনুষ্ঠান। তিনটিরই উদ্ভব ঘটেছে ধর্মীয় উৎস থেকে। এ ছাড়া জয়ন্তীর উৎসও অন্য বিজাতি সম্প্রদায় থেকে আসা। (শব্দ-সংস্কৃতির ছোবল, জহুরী ৩২-৩৩ পৃ: দ্র:)

জয়ন্তী মানে : পতাকা, ইন্দ্রকন্যা, দুর্গা, শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি বা জন্মরাত্রি, যে কোনো ব্যক্তির জন্মতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসব। অতএব বলাই বাহুল্য যে, বিজাতিদের অনুকরণে মুসলিমরা সে সব অনুষ্ঠান পালন করতে পারে না।

১৭ স্বাধীনতা-দিবস : স্বাধীনতা-দিবস, জাতীয়-দিবস, গণতন্ত্র-দিবস, শহীদ-দিবস ইত্যাদি দিবস দেশাচার ও রাজনৈতিক ব্যাপার হলেও তাও এক শ্রেণীর জাতীয় ঈদ। আমরা ইচ্ছা করলেই কোনো ঈদ বা খুশীর দিন নিজেরা তৈরি করে নিতে পারি না। কেননা, আমাদের ইচ্ছা আমাদের সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার সাথে বাঁধা। আমরা মুসলিম অর্থাৎ (আল্লাহর নিকট) আত্মসম্পর্ণকারী। সুতরাং আমরা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিভাবে কোনো ঈদ বা খুশীর দিন আবিষ্কার করে নিতে পারি? তাঁর অনুমতি ও অনুমোদন না থাকলে আমাদের কোনো কিছুই করা ঠিক নয়। এ সকল দিবস পালন করাতে কিছুই না থাকলেও বিজাতির অনুকরণ তো রয়েছেই। তাতে রয়েছে শরীয়ত-বিরোধী নানা কার্য-কলাপ ও অনুষ্ঠান মালা। সুতরাং এগুলোও বিদআত ও শরীয়ত-পরিপন্থী আনন্দ-দিবস। (অফাদারী ২৮৭-২৮৭ দ্র:)

আপনি বলতে পারেন, এটা বিদআত, ওটা বিদআত, তাহলে সুন্নাত কোনটা? আনন্দ করার কি কোনো উপায় নেই ইসলামে? সুন্নাত কোনটা সেটাই তো শিখতে বলছি আপনাকে। আপনার যা কিছু আছে তা অনেক কিছু। কিন্তু না জেনে পরের প্রথা পদ্ধতি আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করে আনন্দ কেন আপনার? নিজ স্বকীয়তা বিকিয়ে অপরের সাথে একাকার হওয়ার মানে কি এই নয় যে, আপনি দুর্বল, আপনি অপরের অনুসরণকারী একজন গোলাম?

সৃষ্টিকর্তার দেয়া দেহ-মন নিয়ে আনন্দ করবেন, তাতে অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার অনুমতি থাকতে হবে। এ কথা আপনি মানুন বা নাইবা মানুন। আপনি বলেন বা না-ই বলেন। আপনি বলতে বাধ্য যে- ''ক্কুল্ ইন্না স্বলা-তী অনুসুকী অমাহ্ইয়া-ইয়া অমামা-তী লিল্লা-হি রব্বিল আ '-লামীন।'' অর্থাৎ, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ বিশ্বজাহানের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহর জন্য; তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম। (সূরা আনআত: আয়াত-১৬২-১৬৩)

১৮ সহস্রাব্দ (মিলেনিয়াম) পালনের বিধান : এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামে হিজরী ইসলামী মাস ও বছর তথা তারিখ ব্যবহার করাই বাঞ্জনীয়। তা বাদ দিয়ে বিধর্মীদের তারিখ ব্যবহার করা প্রয়োজন ছাড়া বৈধ নয়। তা সত্ত্বেও হিজরী শতাব্দী বা সহস্রাব্দ পালন করার তরীকা ইসলামে নেই। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, বিজাতির সাল, শতাব্দী বা সহস্রাব্দ পালন করে অথবা তাদের তা পালন করা দেখে তাদের সঙ্গ দিয়ে উৎসব ও আনন্দ করা বৈধ নয়। এ ব্যাপারে শায়খ ইবনে

জিবরীন বলেন: কাফেরদের কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে মুসলিমদের অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়। তাদের সাথে সামাজিক শিষ্টাচার বজায় রাখার খাতিরেও ঐ সব নব আবিস্কৃত অবৈধ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া আল্লাহর বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন। আসমানী কিতাবসমূহে এবং আল্লাহর শরীয়তে এ ধরনের কার্য-কলাপ বৈধ হওয়ার কোনোই দলীল-প্রমাণ নেই ; বরং এ হলো বিধর্মী খ্রিস্টানদের উদ্ভাবিত এবং ইসলামী শরীয়ত বহির্ভূত কার্যাবলি। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর কোনো অনুমতি নেই।

আর এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, বিধর্মী-অবিশ্বাসীদের ঐ সকল অনুষ্ঠান বা তাদের অন্য কোনো ঈদ-উৎসবে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে প্রকারান্তরে তাদের আবি®কৃত অবৈধ কার্যকলাপে স্বীকৃতি ও সমর্থন তথা বিজাতির সম্মান প্রকাশ হয়ে থাকে। সুতরাং এ উপলক্ষে আয়োজিত কোনোরূপ অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করা মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম।

মুসলমানদের কর্তব্য হলো, তাদের নির্ধারিত উৎসব-অনুষ্ঠান বর্জন করে ঐ দিনটিকে বছরের অন্যান্য দিনের মতোই সাধারণ একটি দিন মনে করা এবং তার বিশেষ কোনো গুরুত্ব বা বৈশিষ্ট্য আছে বলে ধারণা না রাখা। ঈমানদারগণ তো ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দিনসমূহেই আনন্দ উপভোগ করে থাকে, পরস্পর শুভেচ্ছা (ও দুআ) বিনিময় করে এবং তাতে যে সব নামায ও ইবাদত রয়েছে তা পালন করে ঈদ উদযাপন করে। আর মহান আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

১৯ অলিম্পিক উৎসব : অলিম্পিক গেমস হলো প্রাচীন গ্রীসে প্রতি চার বছরান্তের অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা এবং ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রতি চার বছরান্তিক বিশ্বক্রীড়া প্রতিযোগিতার নাম। অলিম্পাস হলো প্রধান গ্রিক দেবতার আবাসরূপে পরিগণিত গ্রিসের কতিপয়প পর্বতের নাম। বাস্তবে অলিম্পিক গেমস-এর সম্পর্ক কিন্তু গ্রিকদের ধর্মীয় উৎসবের সাথেই। আরবি বিশ্বকোষে বুত্বরুস বুস্তানী বলেন, 'এই সকল খেলা প্রথমত: দ্বীনী উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছিল।' (দায়েরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়্যাহ ৪/৬৮৫) আর এ জন্যই দ্বীনী-দৃষ্টিকোণ থেকেই ওলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত করা, তাতে রাজনৈতিক গুরুত্ব দেওয়া এবং তাতে অংশগ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য দুটি কারণে বৈধ নয়- প্রথমত: এই খেলার আসল বুনিয়াদ হলো পৌত্তলিকতা ও শিরক। আর তার মৌসুম গ্রীকদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঈদের মৌসুম বলে মানা হতো। অতঃপর তাদের নিকট থেকেই রোমান ও খ্রিষ্টানরা গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয়ত: অলিম্পিক তার প্রাচীন নামেই আজও প্রসিদ্ধ আছে; যে নাম নিয়ে তা শুরু হয়েছিল। আর তার প্রাচীন নাম অবশিষ্ট থাকাই এ কথার দলীল হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে, এ খেলা মুসলমানদের জন্য অবৈধ ও নাজায়েয।
সাবেত বিন যাহহাক (রা) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) এর যামানায় এক ব্যক্তি নিয়ত করল যে, সে বুয়ানাহ নামক জায়গায় একটি উট কুরবানী (নহর) করবে। সুতরাং লোকটি নবী করীম (সা.) এর কাছে এসে সে কথা উল্লেখ করল (এবং সে মান্নত পালন করতে কোন বাধা আছে কি না, তা জানতে চাইল)। নবী করীম (সা.) লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন? ''সেখানে কি জাহেলী যুগের কোনো পূজ্যমান প্রতিমা ছিল?'' লোকেরা বলল, 'জী না।'' তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, ''সেখানে কি সে যুগের কোনো ঈদ (মেলা) হতো?'' লোকেরা বলল, 'জী না।' আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন, ''তাহলে তুমি তোমার নিয়ত পালন কর। যেহেতু আল্লাহর নাফরমানী করে কোনো নিয়ত পালন করা যাবে না এবং আদম সন্তানের সাধ্যের বাইরে মানা কোনো নিয়ত পালন করতে হয় না।'' (আবূ দাউদ ৩৩১৩)

উক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, কোনো নির্দিষ্ট স্থানের অতীতের কোনো শরীয়ত-বিরোধী ; যেমন মেলা (বা ওরস) ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক থাকাটাই এ কথার দলীল যে, সেখানে কোন শরীয়ত-সম্মত কাজও করা যাবে না। অথচ মান্নতকারী যখন মহানবী (সা.) কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন শরীয়ত-বিরোধী কোনো কর্মকা- বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ভিত্তিতে যদি কোনো জিনিস হারাম ও নিষিদ্ধ হতে পারে, তাহলে নিজের প্রাচীন নাম ও দ্বীনী প্রতীকের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে সে জিনিস অধিকরূপে হারাম ও নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে।

বলা বাহুল্য, অলিম্পিক গেমস তো সর্বধিক থেকেই নিজের প্রাচীন ঐতিহ্য ও রূপ নিয়েই আজও বর্তমান আছে। যেমন এর পারম্ভিক উদ্বোধনের সময় আগুনের শিখা নিয়ে দৌড়ানো হয়, প্রত্যেক চার বছর পর অর্থাৎ পঞ্চম বছরে তো অনুষ্ঠিত হয় এবং তাকে তার প্রাচীন নাম 'অলিম্পিক' নামেই জানা ও প্রচার করা হয়। (মাজাল্লাতুল বায়ান ১৪৪ সংখ্যা, শা'বান ১৪২১ হি:, ২৬-২৭ পৃ: , অফাদারী ইয়া বেযারী, মাকসূদুল হাসান ফায়যী ২৮৫ পৃ:)

২০ মাতৃদিবস : পিতা মাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক। বছরে একবার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সে সম্পর্ক বজায় রাখার কোনো যুক্তিই মুসলিম সন্তানের কাছে থাকতে পারে না। যে সন্তানের মায়ের পদতলে রয়েছে জান্নাত, সেই সন্তান বছরে একদিন মাতৃদিবস পালন করে বাকি কর্তব্য থেকে পলায়ন করবে কেন?
এই অনুষ্ঠান তাদের প্রয়োজন, যাদের ডানা বের হতেই মা-বাবার বাসা ছেড়ে উড়ে যায়। মা-বাবা হতে দূরে থেকে প্রেমিকা অথবা স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করে। যারা মা-বাবার খিদমত কি জিনিস তাই জানে না। যারা বৃদ্ধ মা-বাবাকে ঘরে না রেখে বৃদ্ধ-খোঁয়াড়ে বন্দী রেখে আসে। যারা বছরে হয়তো একবারও মা-বাপের চেহারা দর্শনের অবসর অথবা চেষ্টা রাখে না। কিন্তু যে সন্তানের মা-বাবার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি, যে সন্তানের মা-বাবার কাফের হলেও তাদের সাথে দুনিয়ায় সদ্ভাবে বসবাস করতে বলা হয়েছে, যে সন্তান মা-বাপের অনুমতি ব্যতীত (নফল) জিহাদেও যেতে পারে না, সে সন্তান 'মাতৃদিবস'-এর অনুষ্ঠান পালন করে কি করবে? মা-বাপকে সারা বছর খুশী না রেখে একদিন উপহার-পূজা দিলেই কি তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে? নাকি তাদের পতি সকল কর্তব্য পালন হয়ে যাবে? তবে কেন কুসন্তানদের মতো সুসন্তানরাও সেই দিবস পালন করার জন্য পাল্লা ধরেছে? ইসলামের নির্দেশ কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয়? কেন মুসলিম সন্তান আজ বিজাতির অন্ধানুকরণ করে? কেন বিজাতির প্রত্যেক প্রথাকে লুফে নিতে প্রগতিশীল মনে করে? কেন সে আজ হীনমন্যতার শিকার? তার দ্বীন কি পরিপূর্ণ নয়? তার কাছে কি ইসলাম মনোনীত ধর্ম নয়? তবে কেন বিজাতির গড্ডালিকা-প্রবাহে প্রবাহমান হয়ে নিজের স্বকীয়তা, স্বাধীনতা বিলী করে দিচ্ছে? বলা বাহুল্য যে, বিজাতির অনুকরণে ঐ দিবসে মায়ের জন্য উপহার সামগ্রী পেশ করা, মা-কে নিয়ে আনন্দ-অনুষ্ঠান করা খাস করে ঐ দিনে মায়ের সাক্ষাৎ করা ইত্যাদি বিদআত ও হারাম। (ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ১/১২৪, ইবনে উসাইমীন ৩/৩০১)

২১ বিশ্ব ভালোবাসা দিবস : সারা বিশ্বে অবৈধ প্রণয় বা ভালোবাসাকে পবিত্র করার জন্য, অবৈধ প্রেমে যুবক-যুবতী , তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীকে অনুপ্রাণিত করার জন্য, পৃথিবীর নৈতিক চরিত্রের শত্রু এবং ব্যভিচারের ঠিকেদাররা যেমন প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য নানা প্রচার-মাধ্যম , রঙমহল, পার্ক, সমুদ্র-সৈকত , ঝিল ও উপবন প্রভৃতি রচনা করে রেখেছে, ঠিক তেমনই রচনা করেছে অবৈধ প্রেম বৈধ করার বিভিন্ন আইন-কানুন , তৈরি করেছে প্রেম প্রকাশ করার ও ঝালিয়ে নেয়ার মতো স্মারক-দিবস। ভালোবাসা দিবস এমনই একটি দিবস।

১৪ ফেব্রুয়ারি পালনীয় এই দিনটি কিন্তু খ্রিস্টানদের। একে তাদের ভাষায় (valentine day) বলে। এই ঈদ প্রায় ১৭০০ বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়। সে সময় রোমানরা ছিল পৌত্তলিক। উক্ত ঠধষবহঃরহব নামক সাধু খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলে সরকার তাকে মৃত্যুদ- দেয়। পরবর্তীতে রোমানরা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলে সরকার তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। পরবর্তীতে রোমানরা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তার মৃত্যুর দিনকে প্রেমের শহীদদের স্মরণের দিনরূপে পালন করে। আর তখন থেকেই চালু হয়ে যায় ঐ ভালোবাসা দিবস। ইউরোপ ও আমেরিকায় উক্ত দিবস সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বড় যত্ন ও গুরুত্ব পেয়ে যায়।

অবশ্য ঐ দিনটি রোমানদের নারী ও বিবাহের দেবী মহিমময়ী জুনো কে স্মরণ করার জন্যও পবিত্ররূপে পালিত হয়ে থাকে। আরো বলা হয়ে থাকে যে, একদা রোমান সম্রাট (কাউডিউস) রোমের সকল পুরুষকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ করলে অনেক পুরুষ তাতে আগ্রহ দেখায় না। কারণ বিশ্লেষণ করে জানতে পারে যে, সে সব পুরুষরা হল বিবাহিত এবং তারা তাদের স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে যেতে রাজি নয়। এ জন্য সম্রাট বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। কিন্তু যাজক (ভ্যালেন্টাইন) সম্রাটের সে আদেশ মানতে অস্বীকার করে এবং গোপনে গোপনে গীর্জার মধ্যে লোকেদের বিবাহ কাজ সম্পন্ন করতে থাকে। এ সংবাদ পেয়ে সম্রাট তাকে গ্রেফতার করে ২৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি তার প্রাণদণ্ড দেয়। আর তারপর থেকে তার স্মরণে ঐ দিনকে প্রেমের দিন বলে পালন করা হয়।

অতঃপর গীর্জার পক্ষ থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইটালিতে (valentine day) পালন সরকারিভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। যেহেতু তাদের মতে সেই উৎসব ছিল দ্বীন ও চরিত্র-বিরোধী অবাস্তব উপকথাভিত্তিক। কিন্তু সাধারণ লোকেরা তা আজও পর্যন্ত পালন করতে থাকে। ঐ দিনে পাখিরা নিজ নিজ সঙ্গী নির্বাচন করে বলে রূপকথায় বর্ণিত আছে। এই দিনে (সাধারণত: অবৈধ) প্রেমিক-প্রেমিকারা প্রেম-হৃদয়ের সততা ব্যক্ত করে থাকে। উভয়ের মাঝে প্রেম-প্রীতির অঙ্গীকার নবায়ন করা হয়। একে অন্যকে প্রীতির সাদর সম্ভাবণ জানায়।

এই দিনে প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে গ্রীটিং কার্ড বিনিময় করা হয়। সেই কার্ডে লিখা থাকে (be my valentine) অর্থাৎ, আমার ভ্যালেনটাইন হয়ে যাও। লিখা থাকে প্রেমের নানা কবিতা, গান শ্লোক বা ছোট বাক্য। প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে লাল ফুল (গোলাপ) বিনিময় করা হয়। প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে কেক, মিঠাই ও চকলেট বিতরণ করা হয়। এই দিনে ময়রারা লাল রঙের মিষ্টি (বা কেক) তৈরি করে। তার উপরে প্রেমের প্রতীক হৃদয় অঙ্কন করে।

গ্রীটিং-কার্ডে, উৎসব-স্থলে অথবা অন্য স্থানে প্রেমিকদের ছবি বা মূর্তি স্থাপিত হয়। আসলে তা হলো একটি ডানা-ওয়ালা শিশু; তার হাতে আছে ধনুক এবং সে প্রেমিকার হৃদয়ের প্রতি তীর নিশান লাগিয়ে আছে। এই দিনে প্রেমিক-প্রেমিকারা আনন্দ প্রকাশার্থে পথে-পার্কে-ময়দানে বের হয়। একত্রিত হয় নাইট কাবে ও বিভিন্ন হোটেলে। চলে ডিঙ্ক, ড্যান্স ও ব্যভিচারের বিরাট ধুম! আপনি যদি সত্যিকার মুসলিম হন, তাহলে আপনিই বলুন না, এমন চরিত্র-বিনাশী উৎসব কি কোনো মুসলিম যুবক-যুবতী পালন করতে পারে?

একজন মুসলিম কি বিবাহের পূর্বে কোনো নারীর সাথে অবৈধ প্রণয় ও সম্পর্ক গড়তে পারে? একজন মুসলিম কি কোন বিজাতির উৎসবে আনন্দিত হতে পারে? একজন মুসলিম কি নিজস্ব স্বকীয়তা বিকিয়ে পরের ছাঁচে গড়তে পারে?

যেহেতু নবী করীম (সা.) যে বলেছেন, ''যে ব্যক্তি যে জাতির সানে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই একজন।' (আহমদ ২/৫০, আবূ দাউদ ৪০৩১, সহীহুল জামে' ৬০২৫ নং) আল্লাহ মুসলিম যুবক-যুবতীকে সুমতি দিন। আমীন।

২২ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : মসজিদ, মাদ্রাসা অথবা অন্য কোনো ঘর বা প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়মিত চালু বা আরম্ভ করার জন্য অনুষ্ঠান করে মীলাদ পড়ে অথবা ফিতা কেটে অথবা হাত তুলে জামাআতী মুনাজাত করে উদ্বোধন করার প্রথা ইসলামে নেই। এ প্রথা আল্লাহর রাসূল বা সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে প্রচলিত ছিল না এবং পবিত্র শরীয়তে এর কোন অনুমোদন নেই। কাজেই তা আমাদের ভালো মনে করে করা বিদআত গণ্য হবে। কোনো সাহাবীর বাড়িতে নফল সালাত পড়ার জায়গা নির্দিষ্ট করার জন্য মহানবী (সা.) এর সেখানে গিয়ে নামায পড়া এবং বাড়ির লোকের সে জায়গাকে মুবারক বলে গ্রহণ করার দলীলে মসজিদ-উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বৈধ হতে পারে না। কারণ, তা তো আসলে সাধারণ মসজিদ নয়। তা ছিল নিছক নফল সালাত পড়ার জন্য বাড়ির ভিতরে একটি নির্দিষ্ট জায়গা। আর তাঁর ইন্তিকালের পর বরকত নেয়ার উদ্দেশ্যে কাউকে দাওয়াত দেয়াও বৈধ নয়। বরকত নেয়ার উদ্দেশ্যে কোনো বড় ব্যক্তিত্বকে দাওয়াত দিয়ে ডেকে এনে ধূম করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করলে তা শিরক বলে পরিগণিত হবে। (ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা ১/১৮, ১২৫ দ্র:)

২৩ খিযির (আ)-এর নামে শিরনি : খিযির (আ)-এর পরিচয়: কুরআন কারীমে ঘটনার মূল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি; বরং 'আমার বান্দাদের একজন, বলা হয়েছে। বুখারীর হাদীসে তাঁর নাম খিযির উল্লেখ করা হয়েছে। খিযির অর্থ সবুজ-শ্যামল। সাধারণ তফসীরবিদগণ তাঁর এই নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত, মাটি যেরূপই হোক না কেন।

খিযির (আ)-এর মৃত্যুর দলীল : যারা খিযির (আ)-এর জীবদ্দশা অস্বীকার করে, তাদের বড় প্রমাণ হচ্ছে সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। ইবনে ওমর বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) জীবনের শেষ দিকে এক রাত্রে আমাদেরকে নিয়ে এশার নামায পড়েন। নামায শেষে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেন- ''তোমরা কি আজকের রাতটি লক্ষ্য করছ? এই রাত থেকে একশ' বছর পরে যারা পৃথিবীতে আছে, তাদের কেউ জীবিত থাকবে না।''

(সহীহ বুখারী, হাদীস-১১৬ , মুসলিম, হাদীস-২৫৩৬)

খিযির (আ)-এর মৃত্যু ও জীবদ্দশার সাথে আমাদের কোন বিশ্বাসগত অথবা কর্মগত বিষয় জড়িত নয়। এ কারণেই কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কোন কিছু বলা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে অতিরিক্ত আলোচনা নি®প্রয়োজন। কোন একদিকের উপর বিশ্বাস রাখাও আমাদের জন্য জরুরী নয়। কিন্তু প্রশ্নটি জনগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত, তাই উল্লেখিত বিবরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

২৪ খিযির (আ)-এর নামে শিরনি : আমাদের দেশের দীনহীন এক শ্রেণির মূর্খ মানুষের বিশ্বাস ''খিযির (আ) জীবিত আছেন এবং নদী-সমুদ্রের ভাঙ্গা-গড়ার দায়িত্ব আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন''। এ জন্য জেলে-ধীবর বেশি মাছ পাওয়ার আশায় নদী-সাগরে শিন্নি দেয়। এছাড়া গাজী-কালুসহ বিভিন্ন নামে-বেনামে ও মাজারে শিন্নি দেয়া কিছু লোকের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। আর এসবই শিরক।

২৫ ঘর উদ্বোধন : নতুন ঘর বানানোর পর ঘরে এসে খুশী হয়ে আত্মীয়-স্বজন ও গরীব মিসকীনকে ভোজ করে খাওয়ানো দোষের নয়। তাতে তো আল্লাহর শুকরিয়া আদায় হয়। কিন্তু নতুন ঘর উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে যদি ঘরের বরকত আনা হয়, অথবা সেখানে জিন বাস করতে পারে এই আশঙ্কায় মীলাদ পড়ে ঘর উদ্বোধন করা হয়, তাহলে তা অবশ্যই বিদআত। অনুরূপ ঘরের বরকত নিশ্চিহ্ন দেখে অথবা কোন কল্পিত জ্বিনের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য খরচ করে ঘরের কোণায় কোণায় মাটির ভাঁড়ের মধ্যে লোহার পেরেক পোঁত, বাঁশ পুঁতে তার ডগায় আয়না লটকানো এবং দরজায় দরজায় তাবীয ছিটানো শিরক ও বিদআত। এই শিরক সাধারণত: ঈমান ও মনের দিক থেকে দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই করে থাকে। এই শিরকে মানুষের কাজ হলেও তা মানসিকভাবে কাজের ফর দুষ্ট হয়। অর্থাৎ তার মন সেই বন্ধের প্রতি লটকে থেকে মনের মধ্যে একটা শক্তি সৃষ্টি হয়। আসলে কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হয় না। পক্ষান্তরে ঘর থেকে বরকতহীনতা ও জ্বিন দূর করার পদ্ধতি রয়েছে শরীয়তে। কিন্তু সমস্যা হলো, শরিয়তের বিধি-বিধান জেনে ও আমল করে খুব কমই।

আল্লাহর রাসূল বলেন: ''তোমাদের গৃহকে কবরস্থান বানিও না। যে গৃহে সূরা বাক্বারা পাঠ করা হয় সে গৃহ হতে শয়তান পলায়ন করে।'' (মুসলিম ৭৮০) আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা তিনি ফিতরার যাকাতের মাল পাহারা দিচ্ছিলেন। কয়েক রাত্রি শয়তান এসে মাল চুরি করে নিয়ে যায়। অবশেষে শেষরাত্রে সে তাঁকে বলে যায়, 'বিছানায় শয়ন করে ''আয়াতুল কুরসী'' শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ কর। এতে তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক হিফাযতকারী হবে। ফলে শয়তান সকাল পর্যন্ত তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না।

আবু হুরায়রা (রা) একথা নবী (সা:) এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, ''জেনে রেখো, ও সত্যই বলেছে অথচ ও ভীষণ মিথ্যুক। পরপর তিন রাত্রি তুমি কার সাথে কথা বলেছ তা জান কি আবু হুরায়রা?'' (আবু হুরায়রা বলেন,) আমি বললাম, ''না'' (রাসূল (সা:) বলেন, ''ও ছিল শয়তান!'' (বুখারী ৩২৭৫ নং, ইবনে খুযাইয়া, প্রমুখ)
মহানবী (সা:) বলেন, ''যে ব্যক্তি রাত্রে সূরা বাক্বারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করে, তার জন্য সকল বস্তুর অনিষ্ট হতে ঐ দুটিই আয়াতই যথেষ্ট।'' (বুখারী-৫০০৮ নং , মুসলিম ৮০৭ নং)

অন্যদিকে ঘরের বরকত নষ্ট করে থাকে নিজেরাই। ঘরের লোকে এমন কাজ করে, যাতে আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হতে বাধা দেয়। আল্লাহর রাসূল (সা:) বলেছেন, ''আল্লাহর (রহমতের) ফেশেতাগণ সে গৃহে প্রবেশ করেন না, যে গৃহে কুকুর অথবা মূর্তি বা ছবি থাকে।'' (বুখারী ৫৯৫৮, মুসলিম ২১০৬, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ) কাজেই মন থেকে দুর্বলতা ও সকল কুসংস্কার দূরীভূত করুন। ঘর থেকে দূর করুন সকল প্রকার বরকত দূরীভূতকারী বস্তু। আর সেই সাথে ব্যবহার করুন শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি। আল্লাহ আপনার গৃহ বরকতময় করে দেবেন, ঘরকে জ্বিনমুক্ত করবেন এবং আপনার মনকে করবেন রিকমুক্ত।

লেখকঃ মুহাম্মদ মনজুর হোসেন খান